পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২০ জুন ২০১৭

উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে ইন্টারনেট

বিপাশা চক্রবর্তী

গল্পের বই পড়া আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। পড়ার বইয়ের ফাঁকে বই রেখে বা ছাদের ঘরে গিয়ে লুকিয়ে বই পড়ার অভ্যাস আমাদের ছোট থেকেই ছিল। আর এর মধ্যে আমরা আলাদা করে সেই সময় মজা খুঁজে নিতাম। এখন সেই লুকোচুরিটা না চললেও বই পড়াটা চলে। শৈশবে বাড়ির কোনও অনুষ্ঠানে ছোটদের হাতে বাড়ির বড়দের কিছু টাকাপয়সা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তখন সেই পাওয়া ছিল ছোটদের কাছে দারুণ ব্যাপার। সেই টাকা জমিয়ে নিয়ে যারা বই পড়তে ভালোবাসে তারা দৌড়ত বইয়ের দোকানে। তারপর নিজের পছন্দমতো বই কিনে পড়া। একটু বড় হতেই বইপাড়া কলেজ স্ট্রিট চত্বরে ঘুরে বেড়ানো ব্যাগ কাঁধে নিয়ে। আর এ-দোকান সে-দোকান ঢুঁ মারা নিজের পছন্দের লেখকের লেখা বইয়ের খোঁজে। তখন সমস্ত কিছুই নিজের টিউশনের পয়সা জমিয়ে কেনা। তবে তখন বই পড়ার একটা আলাদা নেশা ছিল সকলের মধ্যে। স্কুলে পড়ার সময় ক্লাসে ওঠার পর নতুন বইয়ের গন্ধটা ছিল দারুণ। ছাড়তেই ইচ্ছে করত না। সারাদিন নতুন বই নিজের পাশে নিয়ে ঘুমোনো, নিজের বইয়ে নিজের হাতে মলাট দেওয়া, নিজের হাতে সুন্দর করে নাম লেখা বইয়ের ওপর সেসব কারুকার্যগুলি করতে খুব ভালো লাগত। নতুন বইয়ের মধ্যে পেনের আঁচড় লাগা মানে প্রচণ্ড অপরাধ করে ফেলেছি যেন, নিজেকেই নিজে শাস্তি দিতে ইচ্ছে করত। তাই নিজের বইকে বাঁচাতে পেনসিল ব্যবহার করাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা তখন এসব করতাম বইয়ের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা থেকে। যে ভালোবাসা আমাদের মধ্যে এখনও থেকে গেছে।

যুগ পালটেছে। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেটের যুগ। এখন ইন্টারনেট খুললেই গোটা দুনিয়া আমাদের হাতের মুঠোয়। তাই সেই ইন্টারনেটের দৌলতে আমরা এখন অনলাইনে বই পড়ে নিতে পারি। একবার ক্লিক করলেই বাজিমাত। এখন অনলাইন-ই সব। কোনও বিষয় জানতে হলেই ইন্টারনেট। আর দুনিয়া হাজির আমাদের সামনে। প্রায় গোটা বিশ্ব এখন যন্ত্রনির্ভর হয়ে পড়ছে। এখন কোনও কিছু জানার জন্য বেশি পরিশ্রম করার দরকার নেই। নামী লেখকদের বইয়ের তালিকা, গল্প, এমনকী কোথায় পড়াশোনার জন্য কী কোর্স করানো হয়, শিক্ষকদের নোট সবই আমরা পেয়ে থাকি ইন্টারনেটের মাধ্যমে। আর তার জন্য কম্পিউটার, ট্যাবলেট কিংবা স্মার্টফোন—কিছু একটা থাকলেই চলবে। শিক্ষকতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ সবই হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে। বিদেশেও এভাবে শিক্ষকতার খুব রমরমা। বিদেশ মুলুকের ছাত্রছাত্রীরা এভাবে সমস্ত কিছু হোমওয়ার্ক পেয়ে থাকে। এই ধরনের কাজের জন্য রয়েছে বিশেষ কিছু সফটওয়্যার। ওখানকার লোকেদের কথায় এর নাম ম্যাজিক মেশিন। যেমন অনলাইন অ্যাপ টেস্ট প্র্যাকটিসের জন্য রয়েছে লার্নেটর, বিবলিওগ্রাফির জন্য রয়েছে ইজিবিব, মেন্ডিন রয়েছে ভোকাবুলারির জন্য, অনলাইন ডেটাবেসের ক্ষেত্রে রয়েছে ভেরিফিকেশনের জন্য আছে অনলাইন মেমোরাইজেশনের ফ্ল্যাশকার্ডের জন্য আছে প্রভৃতি। এছাড়া রয়েছে স্কুল বলে একটি সিস্টেম। আপনি বাড়িতে

এরপর তিনের পাতায়

দুইয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
শব্দের অত্যাচার নিঃশব্দ ক্ষতি
তিনের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
বাংলা ব্যাকরণ ও ইংলিশ গ্রামার
চারের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
বিজ্ঞান
ক্লাস এইট-এর টিউশন
ইতিহাস
পাঁচের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ভূগোল
ক্লাস টেন-এর টিউশন
জীবন বিজ্ঞান
ছয়ের পাতায়
ক্যুইজ, এডু টিপস
জেনারেল নলেজ
সাত ও আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
যে জায়গাগুলোয় কোনওদিনই যাওয়া যাবে না

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

সহায়িকা নির্ভর হয়ো না

তন্দ্রা সরখেল প্রধান শিক্ষিকা, বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস

বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সহায়িকা নির্ভর। হাতের কাছে তৈরি জিনিস পেয়ে যাচ্ছে, স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের মধ্যে উত্তর তৈরি করার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। ফলে দিন দিন কমছে শিক্ষার গুণগত মান।

স্কুলে শিক্ষিকারা যে এত পরিশ্রম করে চলেছেন ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মান ভালো করার জন্য, কিন্তু কোথাও তাঁদের ভাবতে বাধ্য করানো হচ্ছে হয়তো তাঁদের পড়ানোর ক্ষেত্রেই কোনও খামতি আছে। সহায়িকা নির্ভর হওয়ার প্রবণতা আমরা পরীক্ষার খাতাতেও দেখতে পাচ্ছি। সকলের উত্তরপত্র প্রায় একই রকম। লেখার মধ্যে কারওর কোনও নিজস্বতা নেই। ফলে পরীক্ষার খাতা দেখার সময় শিক্ষিকাদের খাতা দেখার যে আগ্রহ তাও কমে যাচ্ছে। অভিভাবকদের প্রতি আমার অনুরোধ, নিজের সন্তানের জন্য তাঁরা বিভিন্ন ধরনের সহায়িকা কেনা থেকে বিরত থাকুন। সহায়িকা কিনে দেওয়ার জন্য তাঁরা অজান্তে নিজের সন্তানের প্রতি বিপদ ডেকে আনছেন। যা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার।

আমাদের সময় আমরা পাঠ্য বইগুলি ভালোভাবে পড়তাম। ছোট থেকে আমরা জানতাম পাঠ্য বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত

এরপর চারের পাতায়

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

অসুবিধা হলেই শিক্ষিকাদের জিজ্ঞেস করি

পায়েল রায় অষ্টম শ্রেণি, বেহালা সারদা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস

জলপাইগুড়ির মেয়ে পায়েল রায়। বর্তমানে সে কলকাতার বাসিন্দা। সপ্তম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে পায়েল। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোর প্রতি শখ রয়েছে তার। পায়েলের অনুপ্রেরণা তার বাবা-মা। তার কথায় তাদের জন্যই আমার সবকিছু। ভালো করে পড়াশোনা করে বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করতে চায় পায়েল।

উত্তরণ: এই স্কুলে কবে থেকে পড়াশোনা করছ?

পায়েল: ক্লাস ফাইভ থেকে।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

পায়েল: সব বিষয় পড়তে ভালোবাসি। তবে ইংরেজি, বিজ্ঞান আমার প্রিয় বিষয়।

উত্তরণ: পড়াশোনার বিষয়ে কার কার সাহায্য পাও?

পায়েল: স্কুলের শিক্ষিকাদের কাছ থেকে ভীষণ ভাবে সাহায্য পাই। সেইসঙ্গে গৃহশিক্ষক ও বাবা-মায়ের কাছ থেকেও সাহায্য পাই।

উত্তরণ: তুমি কী মনে করো, আলাদা করে টিউশন নেওয়ার প্রয়োজন আছে?

পায়েল: আমি মনে করি প্রয়োজন আছে। স্কুলের শিক্ষিকাদের সব সময় কাছে পাই না। তাই প্রয়োজন হলে গৃহশিক্ষিকাদের কাছ থেকেও জেনে নিতে পারি। তবে যে কোনও বিষয় স্কুলের শিক্ষিকাদের কাছ থেকেও খুব সাহায্য পাই।

উত্তরণ: পড়াশোনা আরও ভালো করে করার জন্য বন্ধুদের উদ্দেশ্যে কী বলতে চাও?

পায়েল: প্রথমেই বলতে চাই, কিছু অসুবিধে হলে স্কুল শিক্ষিকাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করা দরকার। তাতে অনেক সমস্যা দূর হবে।

উত্তরণ: পড়া মনে রাখার জন্য কী করো?

পায়েল: খুব ভালো করে পাঠ্যবইটি পড়া দরকার। লিখে অভ্যাস করলে খুব ভালো মনে থাকে। তবে শুধু নোটস দেখে মুখস্থ করে কোনও লাভ নেই।

পাঠ্যবইটি খুব ভালোভাবে পড়া থাকলে পরীক্ষার সময় যেখান থেকে প্রশ্নপত্র আসুক কেন কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বন্ধুদেরও বলব একইভাবে পড়াশোনা করতে।

উত্তরণ: তোমার জীবনের অনুপ্রেরণা কে?

পায়েল: আমার বাবা-মা।

উত্তরণ: তোমার জীবন আরও সফল হোক এই কামনা করি।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২০ জুন ২০১৭

জেনারেল নলেজ

শব্দের অত্যাচার নিঃশব্দ ক্ষতি

অন্তহীন দূষণে ভরে গেছে আমাদের জীবন। বায়ুদূষণ, নদীদূষণ, শব্দদূষণ ইত্যাদি দূষণে যেন আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের দেশে যেমন দূষণের মাত্রা সীমাহীন, তেমনই অনেক দূষণের ক্ষতিও অপূরণীয়। শব্দদূষণ এমনই একধরনের দূষণ, যা অপূরণীয় ক্ষতি ডেকে আনছে আমাদের জীবনে। ব্যস্ত নগরের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে গ্রামীণ জনপথের পথ-প্রান্তরও যেন এখন ভরে উঠেছে নানা ধরনের শব্দ দূষণে। শব্দের অত্যাচারে মানুষের জীবনে অপরিমেয় নিঃশব্দ ক্ষতি হচ্ছে। বাস-ট্রাক-টেম্পো থেকে শুরু করে মোটর সাইকেলের হাইড্রোলিক হর্ন যেমন নগরকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি দেয় না, অটো-ট্রলি-ট্রেকার ইত্যাদিও এখন গ্রামের নিরিবিলি রাস্তাগুলোকে করে তুলেছে অসহনীয়। মাইকের বিকট আওয়াজ হৃদপিণ্ড পর্যন্ত চমকে দেয়। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষিজাত পণ্য সময়মতো বাজারে ছাড়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আমাদের সড়কের বেহাল অবস্থার জন্য ট্রাক-পিকআপ ভ্যান ইত্যাদির হাইড্রোলিক হর্ন (৬০ থেকে ৯০ ডেসিবল)। রেলগাড়ির হুইসল (৯০ থেকে ১১০ ডেসিবল), পটকা-বাজি (৯০ থেকে ১২০ ডেসিবল), ডিজেল চালিত জেনারেটর (৮০ ডেসিবল), ঝগড়া বিবাদে পারস্পরিক উচ্চ স্বরে কথা বলার সময় (পুরুষের ১২০ হার্জ এবং নারীর ২৫০ হার্জ), মিছিল-মিটিংয়ে স্লোগান, লাউড স্পিকার ও মাইকের মাধ্যমে (১১০ ডেসিবল), নিউজ পেপার প্লেস (১০০ ডেসিবল), টেক্সটাইল, পাওয়ার লুম এবং চাবি পাঞ্চিং মেশিন (৮০ ডেসিবল), রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট প্লেয়ার (৪৫ থেকে ৮০ ডেসিবল), জেড বিমান ও সুপারসনিক বিমান (১৪০ ডেসিবল), বিভিন্ন নির্মাণ কাজে (৬০ থেকে ৮০ ডেসিবল), জাহাজ থেকে পণ্য নামানোর সময় ভ্যাকুভেটরের শব্দ, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার (৯০ থেকে ১০০ ডেসিবল), লঞ্চ, ফেরি, স্টিমারের হর্ন (৮০ ডেসিবল), হোটেল, বার কাউন্সিল, বাজার, খেলাধুলোর মাঠ, বাস টার্মিনাল, রেলস্টেশন ইত্যাদিতেও অযাচিতভাবে শব্দ দূষণ হয়ে রাখার সময় নেই কারও হাতে।

বাহ্যিকভাবে শব্দ দূষণ তেমন কোনও কোনও ক্ষতিকর মনে না হলেও, এটি মানুষের মারাত্মক ক্ষতি করছে। শব্দ দূষণ এক নীরব ঘাতক। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতের প্রায় ৯৫ শতাংশ মানুষই শব্দ দূষণের শিকার। পরিবেশ অধিদফতরের এক সমীক্ষা অনুসারে সহনীয় মাত্রার চাইতে বেশি শব্দ মানুষের মানসিক ও শারীরিক অসুস্থতার সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত শব্দ উচ্চ রক্তচাপ, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন, মাথা ব্যথা, বদহজম, পেপটিক আলসার এবং অনিদ্রাজনিত সমস্যার সৃষ্টি করে। ভারতের প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী এন মনিভাসকমের মতে, ভৌত পরিবেশে (বিশেষত বায়ু মাধ্যমে) শ্রুতিসীমা বা সহনক্ষমতা বহির্ভূত অপেক্ষাকৃত উচ্চ-তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন শব্দের (বিশেষ করে সুরবর্জিত বা নয়েজ) উপস্থিতিতে জীব-পরিবেশ তথা মানুষের উপর যে অসংশোধনযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়, সেই পরিবেশ সংক্রান্ত ঘটনাকে দূষণ বলে। এই বর্ণনাকে অন্যভাবেও বলা বা তার বেশি সময় ধরে মাইকে ১০০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ দূষণের মধ্যে কাউকে থাকতে হলে তাকে সাময়িক বধিরতার শিকার হতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করলে যে কেউ বধির হয়ে যেতে পারে। যে কোনও ধরনের শব্দ দূষণ সন্তানসম্ভবা মায়ের জন্যও অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরীক্ষায় দেখা গেছে, লস এঞ্জেলেস, হিথরো এবং ওসাকার মতো বড় বিমানবন্দরের নিকটবর্তী বসবাসকারী গর্ভবতী মায়েরা অন্য জায়গার চাইতে বেশি সংখ্যক প্রতিবন্ধী ও অপুষ্ট শিশুর জন্ম দেন। ইএনটি বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রমাগত শব্দ দূষণের ফলে কানের টিস্যুগুলো আস্তে আস্তে বিকল হয়ে পড়ে এবং তখন একজন মানুষ স্বাভাবিক শব্দ শুনতে পান না। শিশুদের মধ্যে মানসিক ভীতি দেখা দেয়। মাত্রাতিরিক্ত শব্দের ফলে মানুষের করোনারি হার্ট ডিজিজও হতে পারে।

আমাদের দেশে যে সব যানবাহন প্রচলিত আছে তার প্রত্যেকটি সরকারের নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন ছাড়া রাস্তায় নামতে

মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ সীমার মাত্রা ৪০ থেকে ৬০ ডেসিবল। সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা ৮৫ ডেসিবল। এর ওপরে যে কোনও মাত্রার শব্দ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এমনকী, ১০০ ডেসিবল মাত্রার বেশি শব্দে কেউ যদি ১৫ মিনিটের বেশি সময় থাকে, সে চিরতরে বধির হয়ে যেতে পারে।

দিয়ে কৃষিপণ্য পরিবহণ সবসময় হয় না। এদিক থেকে বিচার করলে টেম্পো, ট্রলি, ট্রেকার ইত্যাদি পরিবহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং এর সুফল জাতীয় অর্থনীতিকেও শক্তিশালী করছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কিন্তু এই যন্ত্রদানবগুলো যে পরিমাণ শব্দ সৃষ্টি করে, তার ক্ষতির পরিমাণ লাভের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের জন্য উন্নয়ন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর উন্নয়নের একটি আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে উন্নত যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। কিন্তু একইসঙ্গে এসব যন্ত্রযান ব্যবহারে যথাযথ নির্দেশনাও মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি।

মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ সীমার মাত্রা ৪০ থেকে ৬০ ডেসিবল। সর্বোচ্চ সহনীয় মাত্রা ৮৫ ডেসিবল। এর ওপরে যে কোনও মাত্রার শব্দ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এমনকী, ১০০ ডেসিবল মাত্রার বেশি শব্দে কেউ যদি ১৫ মিনিটের বেশি সময় থাকে, সে চিরতরে বধির হয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ডিজেল ও পেট্রলচালিত ইঞ্জিন যেমন বাস, ট্রাক, লরি, প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেল, টেম্পো থাকে। মাত্রাতিরিক্ত শব্দে স্নায়ুতন্ত্রে সমস্যা সৃষ্টি হওয়া, শ্রবণেন্দ্রিয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এমনকী চিরতরে বধির হওয়ার অস্বাভাবিক নয়। অথচ আমাদের নগর ও গ্রামীণ জীবনে যে সব যন্ত্রদানব প্রতিনিয়ত উচ্চ শব্দ সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তার মাত্রা কত এবং তা আমাদের কতভাবে ক্ষতি করছে সে খবর

যায়। যেমন বজ্রপাত বা মানুষের সৃষ্টি বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে যে বিকট শব্দ, যা সাধারণভাবে মানুষের শ্রবণসহন ক্ষমতার বাইরে ও মানুষের শ্রবণ শক্তির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং মানুষের মস্তিষ্ক ও শরীরে রোগের সৃষ্টি করে তাকে শব্দ দূষণ বলে।

উল্লেখ্য, যে কোনও জায়গায় আধ ঘণ্টা

পারে না। সরকার এই সমস্ত যানবাহন অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রকমের কর বা ট্যাক্স আদায় করে থাকে। তাই সরকার চাইলে শব্দ দূষণের ক্ষেত্রেও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। শব্দ দূষণ আইনত অপরাধ, কিন্তু এটাকে কেউ অপরাধ হিসাবে মানতেই চায় না। আসলে না মানার অভ্যাস মানুষের জগৎ। তাই মানার অভ্যাস আমাদের রপ্ত করতে হবে। আমাদের চালচলন, ব্যবহারে আমরা যে অপরাধ করছি সেটাকে বুঝতে এবং জানতে হবে। বিপরীতে প্রশাসনকেও বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বসহকারে ভাবতে হবে। গাড়িঘোড়ার শব্দ কতটা হওয়া উচিত বা কতটা শব্দ হলে তা দূষণ সৃষ্টি করবে, তা নিয়ে সরকারকে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও হাতে নেওয়া উচিত। শব্দ দূষণ হচ্ছে এক 'সাইলেন্ট কিলার' এবং এর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে সরকার, প্রশাসন তো বটেই মানুষের নিজেদেরও পরিবর্তন করতে হবে। তবেই পরিবর্তন হবে পরিস্থিতির।

বিদিশা রায়চৌধুরী

স্পেশাল টিউশন: বাংলা ব্যাকরণ

ক্রিয়ার কাল

আজ আমরা ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে জানব।

ক্রিয়ার কাল: ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে ক্রিয়ার কাল বলে।

যেমন, আমরা বই পড়ি। পড়া' ক্রিয়াটি এখন অর্থাৎ বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে।

কাল তুমি শহরে গিয়েছিলে। যাওয়া' ক্রিয়াটি পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।

আগামিকাল স্কুল বন্ধ থাকবে। বন্ধ থাকা' কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে।

সুতরাং বলা যায়, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল।

ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার: বর্তমান কাল, অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কাল।

১. বর্তমান কাল: ক) সাধারণ/নিত্যবৃত্ত বর্তমান, খ) ঘটমান বর্তমান, গ) পুরাঘটিত বর্তমান

২. অতীত কাল: ক) সাধারণ অতীত, খ) নিত্যবৃত্ত অতীত, গ) ঘটমান অতীত

৩. ভবিষ্যৎ কাল: ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ, খ) ঘটমান ভবিষ্যৎ, গ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ

যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে, তার কালকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন: সে ভাত খায়। আমি বাড়ি যাই।

২. নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল

স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন: সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়।

৩. ঘটমান বর্তমান কাল

যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন: সে বই পড়ছে। রাধা গান গাইছে।

৪. পুরাঘটিত বর্তমান কাল

ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে পুরাঘটিত বর্তমান কাল হয়। যেমন: এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি।

১. অতীত কাল বা সাধারণ অতীত

বর্তমান কালের পূর্বে যে ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে তার সংঘটন কালই অতীত বা সাধারণ অতীত কাল। যেমন: প্রদীপ নিভে গেল।

২. নিত্যবৃত্ত অতীত কাল

অতীত কালে যে ক্রিয়া সাধারণ অভ্যস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয় তাকে নিত্যবৃত্ত অতীত কাল বলে। যেমন: আমরা তখন রোজ সকালে নদী তীরে ভ্রমণ করতাম।

৩. ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল

অতীত কালে যে কাজ চলছিল এবং যে সময়ের কথা বলা হয়েছে তখনও কাজটি সমাপ্ত হয়নি-ক্রিয়া সংঘটনের এরকম ভাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন: কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা তখন বই পড়ছিলাম।

৪. পুরাঘটিত অতীত কাল

যে ক্রিয়া অতীতের বহু পূর্বেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও কিছু ঘটনা ঘটে গেছে তাকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলা হয়। যেমন: সেবার তাকে সুস্থই দেখেছিলাম। কাজটি কি তুমি করেছিলে?

১.ভবিষ্যৎ কাল বা সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল

যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বা সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন: আমরা মাঠে খেলতে যাব। কাল বৃষ্টি হবে।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ

যে কাজ ভবিষ্যৎ কালে চলতে থাকবে তার কালকে ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল বলে।

৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল

যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। যেমন: গিয়ে থাকব/যাইয়া থাকিব।

সাধারণ বর্তমান কাল বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল

স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। যেমন: সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়। (স্বাভাবিকতা)। আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই। (অভ্যস্ততা)। নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ।

স্থায়ী সত্য প্রকাশে: চার আর তিনে সাত হয়।

ঐতিহাসিক বর্তমান: অতীতের কোনও ঐতিহাসিক ঘটনায় যদি নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের প্রয়োগ হয় তাহলে তাকে ঐতিহাসিক বর্তমান কাল বলে। যেমন: বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন।

কাব্যের ভণিতায়: মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান।

অনিশ্চয়তা প্রকাশে: কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না। যদি', যখন', যেন' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন: বৃষ্টি যদি আসে, আমি বাড়ি চলে যাব। সকলেই যেন সভায় হাজির থাকে। বিপদ যখন আসে তখন এমনি করেই আসে।

সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ

অনুমতি প্রার্থনায় (ভবিষ্যৎ কালের অর্থে): এখন তবে আসি।

প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি দিতে (অতীত কালের অর্থে): চণ্ডীদাস বলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত করতে (অতীতের স্থলে): আমি দেখেছি, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।

'নাই' বা 'নি' শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায়: গতকাল হাটে যাননি।

স্পেশাল টিউশন: ইংলিশ গ্রামার

Past Indefinite Tense

(আগের টিউশনের পর)

Past Indefinite Tense:

অতীত কালের কোনও কাজ বোঝাতে বা অতীতের কোনও অভ্যাস বোঝাতে, যার ফল এখন বিদ্যমান নেই তাকে Past Indefinite Tense বলে।

বোঝার উপায় :

বাংলায় ক্রিয়ার শেষে ল, লাম, ত, তাম, তে, তেন এদের যে কোনও একটি যুক্ত থাকে। যেমন— করেছিল, করিয়াছিল, করেছিলাম, করিয়াছিলাম, করেছিলে, করিয়া ছিলে, করেছিলেন, করিয়াছিলেন, পড়িল, পড়িলাম, পড়িলেন, পড়িত, পড়িতেন।

বাক্যের গঠন :

Subject + past form of main verb + object.

Subject-এর পর person ও number অনুসারে have been বা has been বসে এবং মূল verb-এর শেষে ing যোগ হয়।

উদাহরণ :

আমি ভাত খাইয়াছিলাম বা খেয়েছিলাম - I ate rice.

আমি স্কুলে গিয়েছি বা গিয়েছিলাম - I went to school.

সে স্কুলে গিয়েছে বা গিয়েছিল - He went to school.

Past indefinite tense যুক্ত কোনও sentence-এ যদি main verb না থাকে তাহলে সেখানে be verb ই main verb হিসাবে ব্যবহার হবে।

Past Continuous Tense:

অতীতকালে কোনও কাজ কিছুক্ষণ ধরে চলছিল এরকম বোঝালে Past continuous tense হয়।

বোঝার উপায়:

বাংলায় ক্রিয়ার শেষে তেছিল, তেছিলাম, তেছিলে, তেছিলেন, চ্ছিল, চ্ছিলে, চ্ছিলেন, ছিল, ছিলাম, ছিলে, ছিলেন, এদের যে কোন একটি যোগ থাকে।

বাক্যের গঠন:

Subject + was/were + main verb + ing + object.

Subject-এর পর person ও number অনুসারে was বা were বসে এবং মূল verb-এর শেষে ing যোগ হয়।

উদাহরণ

আমি ভাত খাইতেছিলাম বা খাচ্ছিলাম - I was eating rice.

সে স্কুলে যাইতেছিল বা যাচ্ছিল - He was going to school.

তারা ফুটবল খেলিতেছিল বা খেলছিল - They were playing football.

subject first person and third person singular number হলে was বসবে। we, you, they এবং অন্যান্য plural number এর শেষে were বসবে।

Past Perfect Tense :

অতীত কালে দু'টি কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে তাদের মধ্যে যেটি আগে ঘটেছিল তা Past perfect tense হয় এবং যেটি পরে হয়েছিল তা simple past tense হয়।

বোঝার উপায়:

বাংলায় ক্রিয়ার শেষে কোনও নির্দিষ্ট অতীত ঘটনার আগে, ছিল, ছিলাম, ছিলে, ছিলেন, ল, লাম, লে, লেন, তাম, তে, তেন এদের যে কোনও একটি যুক্ত থাকে।

বাক্যের গঠন:

1st subject + had + verb এর past participle + 2nd subject + verb এর past form +2nd object.

Subject-এর পর had বসে এবং মূল verb-এর past participle form ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ

আমি ভাত খাওয়ার আগে সে বাড়ি আসল - He had come home before I ate rice.

আমি স্কুলে যাওয়ার আগেই সে মারা গেল - He had died before I went to school.

ঘণ্টা পড়ার আগেই তারা স্টেশনে পৌঁছল - They had reached the station before the bell rang.

Past Perfect Continuous Tense:

অতীতকালে কোনও কাজ কোনও বিশেষ সময়ের আগে আরম্ভ হয়ে সেই সময় পর্যন্ত চলছিল বোঝালে Past perfect continuous tense হয়। এখানে যদি দুটি ক্রিয়া উল্লেখ থাকে তাহলে যে কাজটি আগে চলছিল তা Past perfect continuous tense হয়।

বোঝার উপায় :

বাংলায় ক্রিয়ার শেষে তেছিল, তেছিলে, তেছিলাম, তেছিলেন, চ্ছিল, চ্ছিলাম, চ্ছিলে, চ্ছিলেন, এদের যে কোনও একটি উল্লেখ থাকলে এবং অতীতের একটি সময় উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে—

ক) অতীতকালে দুটি কাজই হয়েছিল।

খ) তাদের মধ্যে একটি আগে এবং অপরটি পরে সংগঠিত হয়েছিল।

গ) যেটি আগে সংগঠিত হয়েছিল সেটি দীর্ঘ সময় ধরে চলছিল।

বাক্যের গঠন:

1st subject + had been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + verb এর past form + 2nd object. Subject-এর পর had been বসে এবং মূল verb-এর শেষে ing যোগ হয়।

উদাহরণ

সে যখন আসিল তখন আমি ভাত খাইতেছিলাম - I had been eating rice when he came.

ঘন্টা পড়ার আগে আমরা খেলিতেছিলাম - we were playing before the bell rang.

আমি যখন তার সাথে দেখা করতে গেলাম তখন সে বই পড়িতেছিল - He had been reading book when I went to met with him.

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২০ জুন ২০১৭

ইন্টারনেট

(প্রথম পাতার পর)

বসেই অনলাইন স্কুল বোর্ডের লোকাল ক্যারিকুলাম অনুসরণ করতে পারবেন তার নাম 'স্কুল'।

সকল বিষয়ের মতো প্রতিটি জিনিসের একটি ভালো ও একটি খারাপ দিক আছে। একদিকে বলতে গেলে অনলাইনে পড়াশোনা খুব ভালো একটি মাধ্যম। আপনাকে কোথাও যেতে হচ্ছে না, বাড়িতে বসেই সব উপকরণ আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আবার অন্যদিক হল সমস্ত বিষয়টি খুব একঘেয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসের মধ্যে সকলের মধ্যে পড়াশোনা করা একটা আনন্দ আছে। সামনাসামনি শিক্ষকদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া, তাদের পড়ানোর ধরন, বন্ধুদের সঙ্গে একসঙ্গে ক্লাসরুমে বসা, সকলের সঙ্গে নোটস নিয়ে আলোচনা করা এই সব কিছুর মধ্যে আলাদা একটা ভালোলাগার বিষয় আছে। যা আপনি অনলাইন থেকে পাবেন না। কারণ অনলাইনের ঠেলায় বইয়ের দোকানগুলির আগের থেকে পসার কমেছে। বইমেলা চলাকালীন অবশ্য বই পড়ার পাঠকের সংখ্যা কমেছে একথা বলা চলে না। তবে বইমেলায় যেসব মানুষ ভিড় করে তাদের অধিকাংশ আর সব মেলার মতো এই মেলাতেও ঘুরতে আসে। বুকস্টলে ভিড়ের থেকে বেশি সেলফি তোলার জের আর ফুড স্টলগুলির সামনে ভিড় দেখলেই বোঝা যায়। অনলাইনের বিষয়টি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কৃত্রিমতা বহন করে। তা সত্ত্বেও বর্তমান সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে ইন্টারনেটকে প্রাধান্য দিতেই হবে একথা অনস্বীকার্য।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২০ জুন ২০১৭

শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

প্রতিটি পাতা ভালোভাবে পড়তে হবে। আমরা সেইভাবেই শিক্ষালাভ করেছি। পরবর্তী সময়ে শিক্ষাপ্রধান কাজের সঙ্গেও যুক্ত হয়েছি।

সহায়িকা দেখে কপি করার প্রবণতা বাড়ছে। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি যে ভালোবাসা সেটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যা সমাজের পক্ষে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

প্রত্যেক স্কুলের ফার্স্টবয় ও ফার্স্টগার্ল-রা এই বিভাগে যোগ দিতে পারো।

ফোন: 033 40605837 (১২টা থেকে ৬টা),
ই-মেল: jugasankha.suppli@gmail.com

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
শর্মিলা চন্দ্র (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ**

ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: বিজ্ঞান

চুম্বক

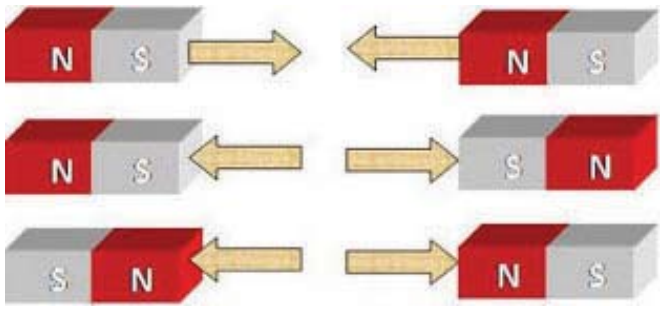

প্রায় ২৫০০ বছর আগে ম্যাগনেস নামে এক মেষপালক পাহাড়ের কোলে পশুচারণের সময় ঘটনাক্রমে একটা পাথর আবিষ্কার করেন যা লোহার পেরেককে আকর্ষণ করে। এটাই চুম্বকের ধর্ম। তার নাম অনুসারে এই পাথরের নাম হল ম্যাগনেট। চুম্বক দুই রকমের হয়— প্রাকৃতিক চুম্বক ও কৃত্রিম চুম্বক।

প্রাকৃতিক চুম্বক বা ম্যাগনেটাইট: এই চুম্বক খনিজ পদার্থরূপে পাওয়া যায়। সহজে এদের বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না।

কৃত্রিম চুম্বক: কিছু বিশেষ পদার্থকে (চৌম্বক পদার্থ) বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করে কৃত্রিম চুম্বক তৈরি হয়।

চৌম্বক পদার্থ— যে সব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় তাদের চৌম্বক পদার্থ বলে। এদের বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা যায়। যেমন, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, কিছু প্রকারের ইস্পাত ইত্যাদি।

অচৌম্বক পদার্থ— যে সব পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করতে পারে না, তাদের অচৌম্বক পদার্থ বলে। যেমন, প্লাস্টিক, রাবার, কাঠ, কাগজ ইত্যাদি।

চুম্বকের কিছু ধর্ম:

১) চুম্বকের দুই প্রান্তে যে দুই অঞ্চলে চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, তাদের চুম্বকের মেরু বলে।

২) মেরু দু'টি আসলে দু'টি বিন্দু।

৩) চুম্বকের ঠিক মাঝামাঝি অঞ্চলে কোনও আকর্ষণ ক্ষমতা থাকে না। তাই ওই অঞ্চলকে উদাসীন অঞ্চল বলে।

৪) চুম্বকের মেরুবিন্দু দুটি আসলে চুম্বকের দুই প্রান্তদেশের কাছাকাছি চুম্বকের ভেতরে অবস্থান করে।

৫) দুই মেরুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে চৌম্বক দূরত্ব বলে। এর সূত্র হল— চৌম্বক দৈর্ঘ্য = চুম্বকটির জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য x ০.৮৬।

৬) ঝুলন্ত বা ভাসমান অবস্থায় যে মেরু উত্তর দিকে মুখ করে থাকে তাকে উত্তর সন্ধানী মেরু বা উত্তর মেরু (N) বলে। আর দক্ষিণমুখী মেরুকে দক্ষিণ সন্ধানী মেরু বা দক্ষিণ মেরু (S) বলে। কোনও চুম্বকের একটি মেরু থাকতে পারে না।

৭) চুম্বকের দুই মেরুকে যোগ করে যে রেখাংশ কল্পনা করা যায় তাকে চুম্বকের অক্ষরেখা বলে।

৮) একটা চুম্বকের চারপাশে যে এলাকা জুড়ে চুম্বকের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ধর্ম কাজ করে সেই অঞ্চলকে চৌম্বক ক্ষেত্র বলে।

৯) দু'টি চুম্বকের সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ আর বিপরীত মেরু একে অপরকে আকর্ষণ করে।

১০) চুম্বকের শক্তি যথাযথ হলে সেটি চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করে। চুম্বকের এই প্রভাবকে চৌম্বক আবেশ বলে। অর্থাৎ চুম্বক কোনও চৌম্বক পদার্থের সংস্পর্শে এলে প্রথমে তাকে আবেশিত করে চুম্বকে পরিণত করে। তারপর মূল চুম্বক ও আবেশিত চুম্বক একে-অপরকে আকর্ষণ করে। তাই বলা হয় আকর্ষণের পূর্বে আবেশ হয়।

দণ্ড চুম্বক: দণ্ড চুম্বক একটি আয়তঘন চুম্বকিত ইস্পাতের দণ্ড। এটি একটি কৃত্রিম চুম্বক।

চুম্বক শলাকা: নানা ধরনের কাজ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য এই ধরনের চুম্বক ব্যবহৃত হয়। এটি আসলে হালকা চুম্বকিত ইস্পাতের পাত। এর দু-প্রান্ত সুচলো এবং কিছু ক্ষেত্রে মেরু চিহ্নিত থাকে। একে একটা খাড়া দণ্ডের ওপর মুক্ত অবস্থায় রাখা হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা ছোট্ট কাচের বাক্সের মধ্যে রাখা থাকে।

তড়িৎ চুম্বক: কোনও চৌম্বক পদার্থতে তড়িৎ প্রবাহিত করে তাকে চুম্বকে পরিণত করা যায়। যেমন একটা লোহার দণ্ডকে অন্তরিত তামার তারের সঙ্গে সুইচ লাগিয়ে সেই তারের দুই প্রান্ত ব্যাটারির দুই প্রান্তের সঙ্গে জুড়ে সুইচ অন করলে তা চুম্বকে পরিণত হয়। চুম্বক শলাকার ব্যবহারে বোঝা যায় যে দণ্ডটিতে কোন মেরুর সৃষ্টি হয়েছে।

চুম্বকের নানারকম ব্যবহার: নৌকম্পাসে চুম্বক শলাকা ব্যবহার হয়। এর উত্তর মেরু নির্দেশিত থাকে। অডিও বা ভিডিও ক্যাসেটের প্লাস্টিকের টেপ, বা কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে প্লাস্টিকের চাকতির ওপর চুম্বকিত পদার্থের আস্তরণ থাকে। ATM কার্ডে বা ক্রেডিট কার্ডে চুম্বকিত স্ট্রিপ ব্যবহৃত হয়। এছাড়া লাউড স্পিকার, সাইকেলের ডায়নামো, ইলেকট্রিক মিটারে, ফ্রিজের দরজায় ইত্যাদিতে চুম্বকের ব্যবহার হয়। সাধারণত ইলেকট্রিক কলিংবেলে, চোখের ভেতর থেকে লোহার সূক্ষ্ম টুকরো বার করতে ডাক্তারি যন্ত্রে, ইলেকট্রিক মোটরে ইত্যাদিতে তড়িৎ চুম্বকের ব্যবহার হয়।

সতর্কতা: চুম্বক ব্যবহৃত হয়েছে এমন কোনও বস্তু বেশি উত্তপ্ত হলে তার কার্যকারিতা নষ্ট হয়। দু'টি ATM কার্ডের চুম্বক স্ট্রিপ মুখোমুখি থাকলে তাও চুম্বকত্ব কমায়। তাই চুম্বক ব্যবহার হয়েছে এমন কোনও যন্ত্র যেমন লাউড স্পিকার বা টিভি ইত্যাদির সামনে শক্তিশালী চুম্বক রাখতে নেই।

পৃথিবী নিজেই একটি চুম্বক। পরিযায়ী পাখি, কচ্ছপ এই চৌম্বক বলরেখা অনুসরণ করেই স্থান পরিবর্তন করে। মেরুজ্যোতি মহাজাগতিক রশ্মির তড়িৎ আধারযুক্ত কণার সঙ্গে ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের ক্রিয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। পায়রা, শামুক, মৌমাছির দেহে ম্যাগনেটাইট নামে চুম্বকীয় বস্তু আছে যা এদের দিক নির্ণয়ে সাহায্য করে।

ক্লাস এইট-এর টিউশন: ইতিহাস

ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কার

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই দেশীয় অভিজাতদের হাত থেকে বিচার ব্যবস্থাকে আলাদা করার প্রস্তাব ওঠে। পাশাপাশি ইউরোপীয়দের সরাসরি তদারকির মাধ্যমে যে সুষ্ঠ বিচার সম্ভব তা নিয়েও আলোচনা চলতে থাকে। ফলে বিচার ব্যবস্থায় ব্রিটিশ কোম্পানির চূড়ান্ত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ শুরু হয়। মনে করা হত এর মাধ্যমে সাধারণ ভারতীয়রা ক্রমেই কোম্পানির শাসনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফে নতুন বিচার ব্যবস্থা চালু করা হয়। প্রতি জেলাতে একটি দেওয়ানি ও একটি ফৌজদারি আদালত তৈরি করা হয়। তবে আইনকানুনে মোঘল প্রভাব তখনও থেকে গিয়েছিল। কিন্তু দেওয়ানি আদালতগুলিতে প্রধান ছিল ইউরোপীয়রাই। পাশাপাশি দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করার কাজ করতেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মুসলিম মৌলবিরা। ফৌজদারি আদালতগুলিতে একজন করে কাজি ও মুফতি থাকতেন। যদিও সেগুলিরও দেখাশোনার চূড়ান্ত দায়িত্ব ইউরোপিয়দের হাতেই ছিল। ১৭৭৩ থেকে ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দেওয়ানি ব্যবস্থায় কয়েকটি পরিবর্তন ঘটে। তার পিছনে মূল উদ্যোক্তা ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পে। ওইসব সংস্কারের মধ্যে দিয়ে বিচারব্যবস্থার চূড়ান্ত ইউরোপীয়করণ করা হয়েছিল। ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে বলা হয়েছিল বিচার বিভাগের সমস্ত আদেশ লিখে রাখতে হবে। সমস্ত দেওয়ানি আদালতগুলিকে একই নিয়মের অধীনে আনার চেষ্টা হয়েছিল।

বিচারে সমতা আনার জন্য দরকার ছিল প্রচলিত আইনগুলির অভিন্ন ব্যাখ্যা। সেই উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের উদ্যোগে ১১ জন পণ্ডিত হিন্দু আইনগুলির একটি সারসংকলন তৈরি করেন। সংকলনটি ইংরেজি অনুবাদ করা হয়। তার ফলে দেশীয় আইনের ব্যাখ্যার জন্য ইউরোপীয় বিচারকদের ভারতীয় সহকারীদের ওপর বিশেষ নির্ভর করতে হতো না। মুসলমান আইনগুলিরও একটি সংকলন বানানো হয়। এসবের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক বিচারব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস আইনগুলিকে সংহত করে কোড বা বিধিবদ্ধ আইন চালু করেন। তার ফলে দেওয়ানি সংক্রান্ত বিচার ও রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব আলাদা করা হয়। জেলা থেকে সদর পর্যন্ত আদালত ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়। নিম্ন আদালতের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদনের অধিকার স্বীকার করা হয়। তবে সমস্ত আদালতেই প্রধান বিচারপতি হতেন ইউরোপীয়রাই। লর্ড কর্নওয়ালিসের বিচারব্যবস্থার সংস্কার বাস্তবে ঔপনিবেশিক বিচার কাঠামো থেকে ভারতীয়দের পুরোপুরি বাদ দিয়েছিল।

মোঘল আমলে বিচারব্যবস্থা থেকে ব্রিটিশ আমলের বিচারব্যবস্থার বদলগুলি সাধারণ ভারতীয়রা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। বিচার কাঠামোকে সংহত করার মাধ্যমে সেগুলি হয়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।

১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিট প্রণীত আইনের ফলে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্যকলাপের ওপর ব্রিটেনের পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় হয়েছিল। ফলে ব্রিটেনের উপনিবেশ হিসাবে ভারতীয় উপমহাদেশের সম্পদ ব্রিটিশ-স্বার্থে পরিচালিত করার উদ্যোগ জোরদার হয়। পাশাপাশি ভারতীয় উপমহাদেশের ঔপনিবেশিক শাসন যত বাড়ল, ততই তাকে চালানোর জন্য সম্পদের দরকার হল। ফলে শাসন চালানোর ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজন হল দক্ষ শাসক যন্ত্রের। গোটা দেশে কোম্পানি-অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে এইরকম শাসন চালু করা হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানি ভারতীয় শাসকদের মতো করে শাসন চালাত। ধীরে ধীরে সেই পরিস্থিতি বদলাতে থাকে। সুষ্ঠ শাসনের জন্য ঔপনিবেশিক শাসন যন্ত্রকে ঢেলে সাজানো দরকার হয়ে পড়েছিল। বিচারব্যবস্থার পাশাপাশি পুলিশ ও সেনা ব্যবস্থা এবং আমলাতন্ত্রের মধ্য দিয়ে সেই ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র বাস্তবগ্রাহ্য রূপ পেয়েছিল।

গভর্নর জেনারেল হিসাবে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক চেয়েছিলেন প্রশাসনিক ব্যয় কমাতে। পাশাপাশি ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের বিষয়টিকেও বেন্টিঙ্ক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এলাহাবাদ ও বারাণসী অঞ্চলে ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁর সময়েই উদ্যোগ নেওয়া হয়। ওই সমস্ত অঞ্চলে মহলওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেছিলেন বেন্টিঙ্ক।

বেন্টিঙ্কের সময় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর প্রভৃতি পদে আবার ভারতীয়দের নিয়োগ করা শুরু হয়। বেন্টিঙ্কের আমলে তৈরি হওয়া আইনে বলা হয়, কোম্পানি কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মাপকাঠি বদলে কেবল যোগ্যতা বিচার করবে। উঁচুপদে নিয়োগ করলেও ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন কম দেওয়া হত।

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২০ জুন ২০১৭

ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ভূগোল

দুর্যোগ আর বিপর্যয়

কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার শক্তি যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করে তখন তাকে দুর্যোগ বলা হয়। আর যখন এই ধরনের দুর্যোগের ফলে জীব-জগতের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়, জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে আমরা বিপর্যয় বলি। এই দু'টি কিন্তু এক অবস্থা নয়। বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, সুনামি, দাবানল এদের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখবে যে, সবার উৎপত্তির কারণ আলাদা আলাদা। ২০০৯ সালের ২৫ মে, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উপকূলে আয়লা নামক ঘূর্ণিঝড়, সঙ্গে বন্যা, জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় প্রায় ২৫০ জন মারা যান, ৪০০ জনের বেশি আহত বা নিখোঁজ, ৫০,০০০-এর বেশি বন্যপ্রাণী মারা যায়। এছাড়া বিদ্যুৎ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি নানা বিষয়ের বিপুল ক্ষতি হয়। দুর্যোগের কারণে তৈরি হওয়া এই রকম অবস্থাকে বিপর্যয় বলে। তাই বলা যায় দুর্যোগ কারণ, আর বিপর্যয় ফলাফল।

দুর্যোগকে মূলত দু'ভাগে করা যায়— প্রাকৃতিক ও মানবিক। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন— ভূতাত্ত্বিক ও জলবায়ুগত। প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি হল ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাত। জলবায়ুগত দুর্যোগ বলতে বোঝায় ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, হ্যারিকেন ইত্যাদি। আরও কিছু জলবায়ুগত দুর্যোগ আছে যাদের জন্য মানুষের কার্যকলাপও দায়ী। ধস, তুষার ধস বা হিমানী সম্প্রপাত, বন্যা, খরা, তুষারপাত, দাবানল ইত্যাদি দুর্যোগের জন্য মানুষ ও জলবায়ু দু'জনেই দায়ী।

আজ আমরা ভূতাত্ত্বিক দুর্যোগগুলি সম্পর্কে জানব।

ভূমিকম্প: হঠাৎ ভূত্বকে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি সৃষ্টি হলে তাকে ভূমিকম্প বলি। এর কোনও পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। একে সবথেকে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে মনে করা হয়। সিসমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে এবং রিখটার স্কেলের সাহায্যে ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয়।

ভূমিকম্প সাধারণত পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্লেট বা পাতগুলির সংঘর্ষের কারণে হয়। পাত সংস্থান তত্ত্ব অনুযায়ী পাতগুলির পরস্পর অভিমুখে বা বিপরীতে বা নিরপেক্ষ চলনের ফলে সংঘর্ষ হলে এই কম্পনের সৃষ্টি হয়। যেখানে কম্পনের উৎপত্তি হয় তাকে কেন্দ্র বা ফোকাস বলে। কেন্দ্র বরাবর ভূপৃষ্ঠের উপরের স্থানকে উপকেন্দ্র বলে। এছাড়া অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হওয়ায় এবং ভূত্বক বা শিলার স্থানান্তরণের ফলেও ভূমিকম্প হতে পারে। ভূগর্ভ ক্রমাগত উষ্ণ হওয়ায় তরল পদার্থ গ্যাসে পরিণত হয়ে চাপ সৃষ্টি করে। সেই চাপের কারণেও ভূমিকম্প হতে পারে। জলাধার তৈরি বা পারমাণবিক পরীক্ষার কারণেও ভূমিকম্প হতে পারে।

ভূমিকম্পের ফলে মানবজীবনের ক্ষতির সঙ্গে ধস, সুনামি, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, ভূগর্ভে খনিজ পদার্থের অবস্থান পরিবর্তন ইত্যাদি হয়। ভূমিকম্পের ফলে শহর বা গ্রাম নিশ্চিহ্ন হতেও দেখা গিয়েছে।

ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা: পৃথিবীর কিছু অঞ্চলে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা সবথেকে বেশি হওয়ায় তাদের ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা বলে। যেমন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয়, মধ্য পৃথিবীর পার্বত্য বলয়।

সুনামি: দু'টি জাপানি শব্দ tsu (বন্দর) আর nami (ঢেউ) থেকে তৈরি হয়েছে। সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাস বা বিধ্বংসী ঢেউ সৃষ্টি হলে তাকে সুনামি বলে। এই সময় অনেক লম্বা, উঁচু, কম্পমান ঢেউ তৈরি হয়।

প্রধানত সমুদ্রের তলায় ভূমিকম্পের কারণেই এই জলোচ্ছ্বাস হয়। এছাড়া উল্কা বা গ্রহাণুর পতন, সমুদ্রগর্ভে অগ্ন্যুৎপাত, সমুদ্রগর্ভে প্রস্তরখণ্ডের বিচ্যুতিও সুনামির কারণ হতে পারে।

এর ফলে মূলত উপকূলবর্তী অঞ্চলে ক্ষতি হয়। বন্যা হয়। বড় বড় বোল্ডার, শিলাখণ্ড ভেঙে ক্ষতি করে। ২০১১-র ১১ মার্চ জাপানের হনসু দ্বীপে সুনামির ফলে ফুকুসিমা নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ প্লান্ট সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

অগ্ন্যুৎপাত: ভূ-অভ্যন্তরের উত্তপ্ত ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের খোলা মুখ যেমন আগ্নেয়গিরি দিয়ে বেরিয়ে আসার ঘটনাকে অগ্ন্যুৎপাত বলে। মাটির তলায় দু'টি সঞ্চরণশীল পাত পরস্পর থেকে দূরে সরে গেলে বা একটি আর একটির উপর উঠে গেলেও অগ্ন্যুৎপাত হয়। আবার দু'টি পাতের একটি আরেকটির নীচে ঢুকে গিয়ে প্রবল চাপের সৃষ্টি করে। ফলে দ্রুত তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয়। ভূ-অভ্যন্তরের শিলা গলে গিয়ে গ্যাসের জন্ম দেয়। আর এই ঊর্ধ্বমুখী চাপের ফলে অগ্ন্যুৎপাত হয়। ম্যাগমার সঙ্গে আরও অনেক গ্যাস মিশে থাকে। এদের মিলিত চাপ শিলার চাপের থেকে কম থাকলে ম্যাগমা গ্যাসের সঙ্গে মিশে থাকে। কিন্তু চাপের পরিবর্তন বা চাপ কমলে বুদবুদ আকারে গ্যাস বেরতে থাকে। কিন্তু বেশি মাত্রায় চাপের পরিবর্তনে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়।

এর ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে চাপের পরিবর্তন ঘটিয়ে জলবায়ুগত দুর্যোগ ডেকে আনে। প্রচণ্ড তাপের ফলে নানারকম ক্ষতি হয়। জীব জগতের প্রাণনাশ হয়। সমুদ্রের তলায় এই ঘটনা ঘটলে সমুদ্রের প্রাণী মারা যায়।

অগ্ন্যুৎপাতের মাধ্যম আগ্নেয়গিরি তিন রকমের— সক্রিয়, সুপ্ত ও মৃত আগ্নেয়গিরি।

ক্লাস টেন-এর টিউশন: জীবন বিজ্ঞান

জনন

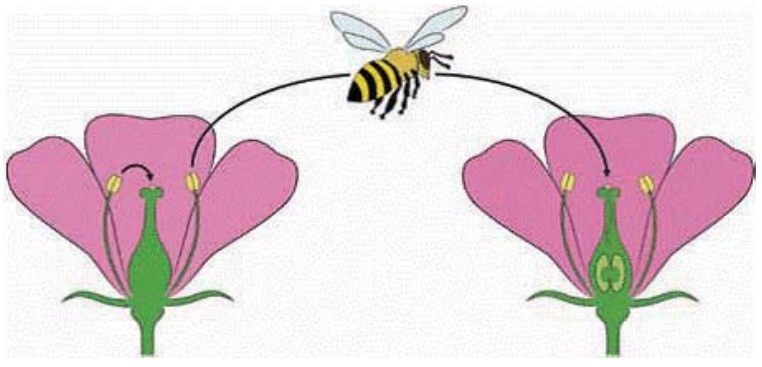

যে পদ্ধতিতে একটি জীব থেকে সমআকৃতি ও সমসত্তাবিশিষ্ট এক বা একাধিক অপত্য জীবের সৃষ্টি হয় তাকে জনন বলে। এর মধ্যে দিয়ে প্রজাতির ধারাবাহিকতা ও অস্তিত্ব বজায় থাকে। জনন জীবের একটা বৈশিষ্ট্য। তাদের আবশ্যিক বা শারীরবৃত্তীয় কাজ (যেমন, রেচন, শ্বসন, পুষ্টি) নয়। পরিণত জীবই জননে সক্ষম। যে নতুন জীব সৃষ্টি হয় তাকে আমরা অপত্য জীব বলি আর যার থেকে সৃষ্টি হয় তাকে বলে জনিতৃ জীব। জননের পদ্ধতি চার রকমের— অঙ্গজ বংশবিস্তার, অযৌন জনন, যৌন জনন এবং অপুংজনি। আজ আমরা শুধু প্রথম দু'প্রকারের জনন পদ্ধতি সম্পর্কে জানব।

অঙ্গজ বংশবিস্তার: জনিতৃ জীবের কোনও অঙ্গ বা অংশবিশেষ থেকে অপত্য জীবের সৃষ্টি হলে সেই পদ্ধতিকে অঙ্গজ বংশবিস্তার বলে। যেমন— গোলাপ, ডালিয়া, জবা, জুঁই, আম, লিচু ইত্যাদি উদ্ভিদে এই জননপদ্ধতি দেখা যায়। এর প্রকারভেদ মূলত দু'রকমের, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম। প্রাকৃতিক উপায়ে রসালো মূল, কাণ্ড ও পাতা থেকে বংশবিস্তার হয়। আর কৃত্রিম উপায়ে শাখাকলম, জোড়কলম ও অণুবিস্তারের মধ্যে দিয়ে বংশবিস্তার হয়। এর ফলে যে অপত্য জীব সৃষ্টি হয় তার চারিত্রিক গুণ জনিতৃ জীবের অনুরূপ থাকে।

মূল: আদা, ডালিয়া, মিষ্টি আলু, শতমূলী ইত্যাদি উদ্ভিদে মাটির তলার, স্ফীত মূল খাদ্য সঞ্চয় করে রসালো হয়। অনুকূল পরিবেশে এদের থেকে নতুন চারাগাছ উৎপন্ন হয়।

কাণ্ড: মাটির কাছে কাণ্ডের পর্ব থেকে নতুন শাখা উৎপন্ন হয়ে মাটির তলায় আনুভূমিকভাবে বর্ধিত হয়। এই অংশে নতুন পর্ব সৃষ্টি হয়ে নতুন চারাগাছ জন্মায়। এই ভাবে কাণ্ড দ্বারা উদ্ভিদ বংশবিস্তার করে। যেমন— কচুরিপানা, টোপাপানা ইত্যাদি।

পাতা: পাথরকুচি, বিগোনিয়া ইত্যাদি গাছের পাতা থেকে অস্থানিক পত্রাশয়ী মুকুল জন্মায়। এখান থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়।

শাখাকলম দ্বারা: পরিণত উদ্ভিদের শাখা কেটে মাটিতে লাগালে সেখান থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্ম নেয়। এই অংশে প্রথমে অস্থানিক মূল ও উপরের অংশে অস্থানিক মুকুল জন্মায়। গোলাপ, আম ইত্যাদি উদ্ভিদে এই পদ্ধতি কার্যকরী হয়।

জোড়কলম: এই পদ্ধতিতে একটি গাছের শাখার সঙ্গে অন্য একই প্রজাতির গাছের শাখা জুড়ে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেওয়া হয়। যেমন, আম, পেয়ারা, লিচু ইত্যাদি।

অণুবিস্তারণ: উদ্ভিদের পৃথক কোষ বা কলার ছোট টুকরোকে (মাইক্রো) বিশেষ দ্রবণে (কর্ষণ) রেখে অল্প সময়ে প্রচুর উদ্ভিদের জন্ম দেওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে যে কোনও ঋতুতে, প্রয়োজন মতো গুণসমৃদ্ধ চারাগাছ পাওয়া যায়। পরিপোষকের সাহায্যে কলার বৃদ্ধি ঘটানো হয় বলে একে কলাকর্ষণ বলে।

অযৌন জনন: যে জনন পদ্ধতিতে গ্যামেটের মিলন ছাড়াই একটি জনিতৃ জীব থেকে দেহ কোষের বিভাজনের মাধ্যমে বা রেণুর সাহায্যে অপত্য জীব জন্ম নেয় তাকে অযৌন জনন বলে।

এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একটি জীবের প্রয়োজন হয় ফলে জনিতৃ জীব ও অপত্য জীবের বৈশিষ্ট্য এক রকম হয়। এরজন্য জীবদেহের কোনও নির্দিষ্ট অঙ্গের প্রয়োজন হয় না। এই ভাবে জীব দ্রুত বংশ বিস্তার করে।

মনে রেখ, এই জননের একক হল রেণু বা স্পোর। রেণু অঙ্কুরিত হয়ে নতুন জীব জন্ম নেয়। যেমন— ক্ল্যামাইডোমোনাস, মিউকর, অ্যামিবা, হাইড্রা ইত্যাদি। এটি পাঁচ রকমের হয়।

বিভাজন—

দ্বিবিভাজন: ছত্রাক, শৈবাল, অ্যামিবা জাতীয় এককোষী প্রাণীতে ও ব্যাকটিরিয়াতে মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় দু'টি অপত্য কোষ জন্ম নেয় তাই একে দ্বিবিভাজন বলে।

বহু বিভাজন: জনিতৃ কোষের নিউক্লিয়াসটি বার বার মাইটোসিস পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। পরে এর থেকে একাধিক অপত্য কোষের সৃষ্টি হয়। যেমন— ইস্ট, ক্ল্যামাইডোমোনাস, অ্যামিবা ইত্যাদি।

কোরকোদগম: প্রথমে জনিতৃ জীবের গায়ে কোরক সৃষ্টি হয়। এটি ধীরে ধীরে পুষ্টিরস সংগ্রহ করে ও আলাদা হয়ে অপত্য জীব সৃষ্টি করে। যেমন— ইস্ট, হাইড্রা ইত্যাদি।

খণ্ডিভবন: প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক আঘাতে জীবদেহ খণ্ডিত হয়ে খণ্ড হয়ে যাওয়া অংশ থেকে অপত্য জীব সৃষ্টি হলে তাকে খণ্ডিভবন বলে। যেমন— স্পাইরোগাইরা, অসিলেটোরিয়া ইত্যাদি।

রেণু উৎপাদন: এই পদ্ধতিতে রেণুস্থলীর মধ্যে উৎপন্ন চল বা অচল রেণু মুক্ত হয়ে অঙ্কুরিত হয়ে নতুন উদ্ভিদের জন্ম দেয়। যেমন— ছত্রাক, মস, ফার্ন ইত্যাদি।

পুনরুৎপাদন: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বা কারোর দ্বারা অঙ্গহানি হলে যে পদ্ধতিতে সেই অঙ্গ থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবের জন্ম হয় তাকে পুনরুৎপাদন বলে। যেমন— প্ল্যানেরিয়া প্রজাতি।

তোমাদের প্রিয় 'উত্তরণ'-এ **'আমার স্কুল'** বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো 'CONTENT FOR AAMAR SCHOOL'
মেল আইডি:
jugasankha.suppli@gmail.com

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ২০ জুন ২০১৭

ক্যুইজ

১) কোন প্রাণীর জলসংবহন তন্ত্র থাকে?
২) ইউগ্লিনার গমন অঙ্গের নাম কী?
৩) গমনে সহায়ক পেশি কোনটি?
৪) উদ্ভিদের কোন কলাটির মাধ্যমে রক্তের উৎস্রোত প্রক্রিয়াটি ঘটে?
৫) দণ্ডাকার ব্যাকটেরিয়াকে কী বলে?
৬) কানের কোন অংশ ভারসাম্য হিসাবে কাজ করে?
৭) কোন বিজ্ঞানী প্রথম সমুদ্রের লবণ থেকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করেন?
৮) কোন পদ্ধতিতে ইউরিয়া উৎপন্ন হয়?
৯) পৌস্টিক নালির কোন অংশে প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচক থাকে?
১০) মুস্তাকাব-উল-তোয়ারিখ কে রচনা করেন?
১১) সুলেহ কুল শব্দের অর্থ কী?
১২) আকবরের প্রধানমন্ত্রীকে কী বলা হতো?
১৩) টেগার্ট কে ছিলেন?
১৪) বৈদিক সমাজের ভিত্তি কী ছিল?
১৫) সাঁওতালরা কোন জাতির বংশধর?
১৬) দস্তক কথাটির অর্থ কী?
১৭) কাদের নর্ডিক বলা হতো?
১৮) মথুরা শিল্পকলা কোন সময়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে?
১৯) স্বাধীনতার আগে ভারতে প্রথম লৌহ-ইস্পাত কারখানা কোথায় গড়ে ওঠে?
২০) সমুদ্রের জলরাশি যখন একই স্থানে অবস্থান করে বায়ুপ্রবাহের প্রবাহে ওঠানামা করে, তখন তাকে কী বলে?
২১) ভারতের কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগার কোথায় আছে?
২২) ঝুম কী?
২৩) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের ঘূর্ণবাতের নাম কী?
২৪) হুড্রু জলপ্রপাত কোন নদীর ওপর সৃষ্টি হয়েছে?

২৫) পম্পাস তৃণভূমির উত্তর পশ্চিমে যে অসংখ্য ছোট ছোট জলাভূমি দেখা যায়, তাদের কী বলে?
২৬) পৃথিবীর গভীরতম গিরিখাত কোনটি?
২৭) পৃথিবীর নিম্নতম হ্রদের নাম কী?
২৮) অন্ধ্রপ্রদেশের ঘামাম কীজন্য বিখ্যাত?
২৯) কোয়েম্বাটুর মহানগরটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
৩০) কোন জায়গার স্থানীয় সময়কে ভারতের প্রমাণ সময় ধরা হয়?
৩১) কোন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারতের স্থলপথে যোগাযোগ নেই?
৩২) ভারতের বৃষ্টিপাতকে কোন বায়ু নিয়ন্ত্রণ করে?
৩৩) ভারতের কোন রাজ্যে সবচেয়ে কম পলিমাটি দেখা যায়?
৩৪) ভারতের দীর্ঘতম খাল কোনটি?
৩৫) স্টিভেনসন স্ক্রিনের সাহায্যে কী করা হয়?
৩৬) চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলে কী ধরনের আবহবিকার হয়?
৩৭) হিমালয়ের পাদদেশে নুড়ি বালিপূর্ণ সচ্ছিদ্র ভূমিকে কী বলে?
৩৮) লিমো কী?
৩৯) বিহারের কোডারমা কীজন্য বিখ্যাত?
৪০) কল্পসূত্র কী?

উত্তর: ১) তারা মাছ। ২) ফ্ল্যাজেলা। ৩) ঐচ্ছিক পেশি। ৪) জাইলেম কলা। ৫) ব্যাসিলাস। ৬) ওটোলিথ। ৭) জোসেফ প্রেস্টলি। ৮) প্রোটিন বিপাক। ৯) মুখবিবর। ১০) বদাউনি। ১১) পরধর্ম সহিষ্ণুতা। ১২) ভকিল। ১৩) কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার। ১৪) পরিবার। ১৫) নেগ্রিটো জাতির। ১৬) বাণিজ্যিক ছাড়পত্র। ১৭) আর্যদের। ১৮) কুষাণ যুগে। ১৯) ভদ্রাবতীতে। ২০) সমুদ্র তরঙ্গ। ২১) লখনৌ। ২২) একজাতীয় কৃষিপদ্ধতি। ২৩) লু। ২৪) সুবর্ণরেখা। ২৫) কানাডা বা এসটেরো। ২৬) নেপালের কালী নদীর গিরিখাত। ২৭) মরুসাগর। ২৮) আকরিক লোহার জন্য। ২৯) কাবেরীর উপনদী নোয়িল। ৩০) এলাহাবাদ। ৩১) শ্রীলঙ্কা। ৩২) দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ৩৩) মধ্যপ্রদেশ। ৩৪) ইন্দিরা গান্ধী খাল। ৩৫) বায়ুর উষ্ণতা পরিমাপ করা হয়। ৩৬) কার্বনেশন। ৩৭) ভাবর। ৩৮) চুনাপাথর গঠিত অঞ্চলের অনুর্বর মৃত্তিকা। ৩৯) অভ্রখনির জন্য। ৪০) জৈন গ্রন্থ।

এডু টিপস

বাচ্চাদের সঙ্গে পজিটিভ আলোচনা করতে হবে

মাঝে মধ্যেই সকলের সামনে বাচ্চাদের আলটপকা মন্তব্যের কারণে বিব্রত হতে হয় প্রায় সব বাবা-মাকেই। জমজমাট আড্ডাকে এক মুহূর্তে চুপ করিয়ে দিতে পারে বাচ্চার একটি কথা। এর কারণ, আমরা বাবা-মায়েরা ভাবি না যে বাচ্চা তার চারপাশের সমস্ত কিছুকে অবজার্ভ করে। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে কোন কথাটা বলা উচিত সেটা বোঝার বয়স তার হয়নি। ছোটবেলায় একটি গল্প আমরা হয়তো সবাই পড়েছি যেখানে একটি বাচ্চা বাড়িতে বেড়াতে আসা তার মায়ের দুই মাসির সামনে মায়ের অসাবধানে করা মন্তব্যের বর্ণনা করে নিজের মাকে এবং অতিথিদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল।

বাচ্চাদের সামনে নেগেটিভ কথাবার্তা বললে এরকম পরিস্থিতিতে আপনাকে পড়তে হতেই পারে। বাচ্চার সামনে কী আলোচনা করবেন, আর কী করবেন না সে সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা খুবই জরুরি। বাচ্চাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং শ্রবণশক্তি আপনার অনুমানের চেয়ে অনেক বেশি। কোনও কিছুর সামান্য বদলও ওদের চোখ এড়ায় না। তাই বাবা-মায়েরা পরস্পর কিংবা অন্য কারও সঙ্গে বাচ্চার সামনে কোনও বিষয় আলোচনা করলে, বাচ্চার ওপর তার কী প্রভাব হতে পারে সেটা আগে ভেবে রাখুন। কোনও খারাপ কথার প্রভাব যত না বাচ্চাদের ওপর পড়ে তার থেকে অনেক বেশি পড়ে নেতিবাচক কথার প্রভাব। বাচ্চাদের মন পরিষ্কার তাই ওদের স্বচ্ছ মনটাকে অহেতুক নষ্ট করবেন না। স্বাধীনভাবে ওকে নিজের মতামত তৈরি করতে দিন।

অন্যের নিন্দা করার সময় অনেকেই খারাপ ভাষা ব্যবহার করে থাকেন, যেটা বাচ্চারা সহজেই ক্যাচ করে। তারপর সেই শব্দ অন্য কোথাও গিয়ে হয়ত সকলের সামনে ব্যবহার করল। তখন বাবা মায়ের মান-সম্মান কোথায় থাকবে? তাই বাড়িতে কথা বলার সময় শব্দচয়নের ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে।

বাচ্চারা বাবা-মায়ের কাছে সবসময় নতুন নতুন জিনিস শিখতে চায়, কিন্তু সবকিছু তাদের একবারে শেখানোর চেষ্টা করবেন না। প্রত্যেক বয়সে তারা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস শিখবে। সেই সময়টুকু ওদের দিতে হবে। আপনি যদি বাচ্চার সামনে কোনও ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে নিন্দা করেন তাহলে সেই ব্যক্তি বা বিষয়টি যে খারাপ সেই ব্যক্তি বা বিষয়টি যে খারাপ সেই লেবেল লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্রই অমুক ভালো তমুক খারাপ বলা বন্ধ করাই নয় বাচ্চাকেও বলা যাবে না এটা করলে তুমি ভালো ছেলে বা মেয়ে হবে। ওটা করলে খারাপ হবে। এই ধরনের মন্তব্য তাদের স্বাধীন মতামত গড়ে তোলার পরিপন্থী।

সবসময় চেষ্টা করতে হবে বাচ্চারা যেন তাদের ভুল থেকেই সঠিন রাস্তা চেনার শিক্ষা পায়। যা পরবর্তী সময়ে তাদের মানসিকভাবে অনেক দৃঢ় করে তুলবে। তাদের কখনও ব্যাড বয় বা গার্ল কিংবা বোকা বলে আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানবেন না। বাবা-মায়েরা প্রায়ই একজনের সঙ্গে আরেকজনের পরীক্ষার রেজাল্টসহ বিভিন্ন বিষয়ে তুলনা করে বাচ্চাদের হতাশ করেন। যার কারণে তারা ভবিষ্যতে ভালো রেজাল্ট ও অন্য ভালো কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাই অবশ্যই সন্তানের ভালো কাজের প্রশংসা করা উচিত, এতে করে লেখাপড়া বা খেলাধুলা যে বিষয়ে প্রশংসা করা হবে সেই বিষয়ে পারফরম্যান্স দ্বিগুণ হবে। তাই যে কোনও পরিস্থিতিতেই মাথা ঠান্ডা রেখে বাচ্চাদের বোঝান। শুধু বাচ্চা কেন, বাবা-মায়েরা নিজেরাও যদি কোনও কারণে পরস্পরের উপর চিৎকার করেন, তাহলে বাচ্চাও ধরে নেবে রাগ প্রকাশের মাধ্যমই হল চিৎকার-চেঁচামেচি করা এবং সে নিজেও সেটাই করতে থাকবে। তাই চেষ্টা করুন সবদিক থেকে নিজের বাচ্চাকে সুস্থ পরিবেশ দিতে। যেখানে সে একজন সুস্থ মনের মানুষ হিসাবে বড় হয়ে উঠবে।

জেনারেল নলেজ

হাতি

হাতি একটি অদ্ভুত প্রাণী। এরা স্থলের সবচেয়ে বড় প্রাণী অথচ নিরামিষাশি। এরা নিরামিষাশি হলেও এদের গায়ের জোর যে কোনও মাংসাশি প্রাণীর থেকে বেশি। সবচেয়ে আশ্চর্য হল হাতির শুঁড়। হাতির শুঁড় হাতির নাকও আবার উপরের ঠোঁটও বটে। হাতির শুঁড় লম্বায় প্রায় সাত ফুট পর্যন্ত হয়।

হাতি তার শুঁড় দিয়ে অনেক কাজ করতে পারে। মাটি বা গাছ থেকে খাবার সংগ্রহ করে, ধুলো বা জল নিজের পিঠে ছড়াতে পারে। জল নিয়ে নিজের মুখে ঢোকায়। তাছাড়াও শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় এবং গন্ধ শুঁকে অন্য প্রাণীর অস্তিত্ব বুঝতে পারে।

একটা হাতি তিন থেকে সাড়ে তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। হাতির কান প্রায় এক মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। হাতির বড় বড় কান এদের অনেকরকম ভাবে সাহায্য করে। কানের সাহায্যে হাতি বহু দূরের শব্দ পরিষ্কারভাবে শুনতে পায়। এদের কান শরীরের তাপ বার করে দিয়ে শরীরকে ঠান্ডা রাখে। অত বড় শরীর হওয়ার কারণে গরমের দেশে হাতির পক্ষে গাছের ছায়া খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়। হাতি আক্রমণ করার সময় কান দু'টিকে দু'পাশে ছড়িয়ে দেয়। তখন হাতিকে আরও বড় দেখায়। এছাড়াও পোকা-মাকড় তাড়াতে হাতি কান ব্যবহার করে।

লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ক্রমাগত উষ্ণতা পরিবর্তনের মতো কঠিন ধাপ পেরিয়ে বর্তমানে টিকে থাকা আমাদের চির চেনা হাতি প্রজাতিটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে পড়েছে।

একটি ভাগের নাম এশিয়ান হাতি যার বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছে Elephas maximus (এলিফাস ম্যাক্সিমাস)।

অপর ভাগের নাম আফ্রিকান হাতি যার বৈজ্ঞানিক নাম Loxodonta (লোক্সোডান্টা আফ্রিকানা)।

লক্ষ লক্ষ বছর এশিয়া ও আফ্রিকায় থিতু হয়ে বসবাসের ফলে আবহাওয়াজনিত কারণে মানুষের মতোই এই হাতি প্রজাতিতেও চলে আসে আকার আকৃতি ও গঠনগত কিছু ভিন্নতা।

লম্বায় সাধারণত এশিয়ান হাতি ৬-১১ ফুট হয়ে থাকে আর আফ্রিকান হাতি হয় ৬-১৩ ফুট। গড় ওজন এশিয়ান হাতির যেখানে ২-৫ টন, আফ্রিকান হাতির সেখানে ২-৭ টন। এশিয়ান হাতির গায়ের রং বেশ ফর্সা ও মসৃণ তুলনামূলকভাবে আফ্রিকান হাতির গায়ের রং কালো ও কোঁচকানো। কানের আকৃতিও প্রমাণ দেয় কোনটা আফ্রিকান আর কোনটা এশিয়ান। আফ্রিকান হাতির আছে প্রকাণ্ড কান যা দিয়ে প্রচণ্ড গরমে বাতাস করে নিজের গা নিজেই জুড়িয়ে নিতে পারে। পক্ষান্তরে এশিয়ান হাতির আছে ছোট কান। ভুঁড়ির আকৃতিতেও দেখা যায় ভিন্নতা। এশিয়ান হাতিদের ভুঁড়ি গলা থেকে নীচের দিকে অনেকটা সমান। আর আফ্রিকানদের বেলায় গলা থেকে ভুঁড়ি ক্রমান্বয়ে নীচের দিকে ঝুলে আসে। এশিয়ান হাতিদের বুকের পাঁজরের হাড় এক জোড়া কম অর্থাৎ আফ্রিকান হাতির রয়েছে ২১ জোড়া হাড় আর এশিয়ান হাতির ২০ জোড়া। আফ্রিকান স্ত্রী-পুরুষ উভয় হাতির প্রলম্বিত দাঁত আছে কিন্তু এশিয়ান হাতিদের ক্ষেত্রে শুধু পুরুষ হাতিদের এই দাঁত দেখা যায়। এশিয়ান হাতির শুঁড় তুলনামূলক একটু শক্ত ও শুঁড়ের শেষ প্রান্ত একদিক সামান্য বেরিয়ে থাকে আঙুলের মতো। যা তাকে যে কোনও জিনিস শক্ত ভাবে ধরতে সাহায্য করে। আফ্রিকান হাতিদের শুঁড়ের শেষ প্রান্তে দু'দিক বেরিয়ে থাকে। খাদ্য তালিকায় এশিয়ান হাতিরা বেশি পছন্দ করে ঘাস, পক্ষান্তরে আফ্রিকান হাতির পছন্দ পাতা।

হাতির দাঁতের ব্যবহার নেই, তাই বিবর্তনে ক্রমেই বিলীন হচ্ছে গজদন্ত। ঐরাবতকুলে দাঁতের আকাল পড়েছে। শুধু আফ্রিকার হাতি নয়, এশীয় পুরুষ হাতিদের মধ্যেও দাঁতালের সংখ্যা কমেছে। তুলনায় বেড়ে গেছে 'মাকনা' বা দন্তহীন পুরুষ হাতির সংখ্যা। হস্তিনীদের অবশ্য দাঁত নিয়ে ঝকমারি নেই। মুখের দুপাশে ছোট দাঁত নিয়ে দিব্যি আছে তারা। বিশেষজ্ঞরা ডারউইন তত্ত্ব দিয়েই বিষয়টির ব্যাখ্যা করছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শরীরে পরিচিত অঙ্গের ব্যবহার কমে গেলে জিন গঠনেও তার প্রভাব পড়ে। বিবর্তনের প্রাথমিক শর্ত মেনেই জিনগত পরিবর্তন ঘটছে হাতিদের। আর সেইজন্যই দাঁত গজানোর হার হ্রাস পাচ্ছে। উগান্ডার কুইন এলিজাবেথ পার্কের ৯ শতাংশ পুরুষ হাতিই দাঁতবিহীন। জাম্বিয়ার লুয়াঙ্গার অভয়ারণ্যের ৩৮ শতাংশ পুরুষ হাতিরই দাঁত নেই। শুধু বিদেশে নয়, আমাদের দেশেও গজদন্ত ক্রমশ বিলীয়মান। কেবলমাত্র শৌর্য-বীর্যের প্রতীক হিসাবে নয়, হাতিদের নিত্যকার জীবনেও দাঁতের গুরুত্ব অপরিসীম। জঙ্গলে গাছগাছালির কচি ডাল ভাঙতে শুঁড়ের সঙ্গে হাতির দাঁতেরও প্রয়োজন যথেষ্ট। নদীর চরে বালি খুঁড়ে জল খাওয়ার ক্ষেত্রেও দাঁতের ব্যবহার অপরিহার্য। দলের দখল নিতেও দুই পুরুষ হাতির লড়াইয়ে দাঁতই মূল অস্ত্র। এত উপযোগিতা সত্ত্বেও হাতি তাদের দাঁত হারাচ্ছে। কারণ যতটা প্রয়োজন তার থেকে অনেকটাই কম ব্যবহার করছে দাঁত। এর ফলেই ছোট হয়ে আসছে দাঁত।

নর্থ সেন্টিনাল আইল্যান্ড, আন্দামান

ভ্রমণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২০ জুন ২০১৭

যে জায়গাগুলোয় কোনওদিনই যাওয়া যাবে না

পাহাড়, পর্বত, উপত্যকা, বনজঙ্গল, তৃণভূমি, মরুভূমি ইত্যাদি পৃথিবীর এ ধরনের নানা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করার মতো। এগুলো ছাড়াও পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান রয়েছে যা দেখার মতো, অনেক স্মৃতি তৈরি করার মতো এবং আমাদের জীবনকাল এমন অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু কেমন লাগবে যখন আমরা কিছু আশ্চর্যজনক এবং চমৎকার স্থান দেখা থেকে বঞ্চিত হবো? অথচ দুঃখজনক হলেও এটা আমাদের মেনে নিতেই হবে। কারণ পৃথিবীতে এমন অনেক আশ্চর্যজনক স্থান রয়েছে, যেখানে সর্বসাধারণের যাওয়ার কোনও অনুমতি নেই। এ ধরনের অনেক জায়গা রয়েছে যে সম্পর্কে জানলে রীতিমতো অবাক হতে হয়। কিন্তু যতই আগ্রহী হই না কেন, এসব জায়গায় প্রবেশের অনুমতি কোনওদিনই মিলবে না। আজ এমনই কয়েকটি স্থানের কথা আলোচনা করা হল।

নর্থ সেন্টিনাল আইল্যান্ড, আন্দামান

এই দ্বীপটিতে বাইরের যারা প্রবেশ করে তাদের এখানকার আদিবাসীরা নির্মমভাবে মেরে ফেলে। যেহেতু এখানকার উপজাতিরা ঘন জঙ্গলে বসবাস করে, তাই তারা বাইরের জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞ। দ্বীপটিকে আধুনিকতার ছোঁয়া পড়েনি। এই দ্বীপটির বাসিন্দারা আধুনিক যুগের মানুষের সাথে কোনও যোগাযোগও করতে চায় না। উত্তর সেন্টিনাল দ্বীপটি তাই আজও ভারত তথা বহির্বিশ্বের কাছে রহস্যই হয়ে আছে। আধুনিক সভ্যতার লোকজন এখনও দ্বীপটির মানুষের ভাষা, ধর্মানুষ্ঠান এবং তাদের বসতবাড়ির রহস্য খুব কমই জানতে পেরেছে। আধুনিক যুগে অত্যাধুনিক সব ক্যামেরা থাকা সত্ত্বেও ওই দ্বীপের মানুষের কোনও স্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব হয়নি। কিছু কিছু ছবি তোলা হলেও সেগুলি অস্পষ্ট। সে সমস্ত পর্যটক এই দ্বীপটি দেখার চেষ্টা করেছেন কিংবা কাছে গিয়ে দেখেছেন, তারা প্রত্যেকেই দ্বীপটির রহস্যময় উপজাতির আক্রমণের শিকার হয়েছেন।

২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে ভূমিকম্পের পর বিমান অনুসন্ধানকারীরা ক্ষতির পরিমাণ বিশ্লেষণ করতে দ্বীপটিতে প্রবেশ করতে গেলে স্থানীয়রা তাদের ওপর হামলা করে। এমনকী ২০০৬ সালে দু'জন জেলে রাস্তা হারিয়ে দ্বীপটিতে প্রবেশ করায় উপজাতির লোকেরা তাদের নির্মমভাবে মেরে ফেলে।

হেয়ার্ড আইল্যান্ড ভলকানো, অস্ট্রেলিয়া

এই দ্বীপটিতে ২০০০ সাল থেকে ২৭৪৫ ফুট উঁচু জটিল আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়েছে। মাদাগাস্কার এবং অ্যান্টার্টিকার মধ্যে অবস্থিত এই দ্বীপটিতে দুই কিলোমিটার লম্বা লাভা প্রবাহিত হয়ে আসছে ২০০০ সাল থেকে। ৩৬৮ বর্গ মাইলের এই দ্বীপটি পাহাড়ে ভরপুর। এছাড়াও রয়েছে ৪১টি হিমবাহ। পেঙ্গুইন, সিল এবং সামুদ্রিক পাখির আবাসস্থল এই প্রাকৃতিক বিস্ময়কর দ্বীপটি।

স্নেক আইল্যান্ড, ব্রাজিল

ব্রাজিলের ইলহা দ্য কুয়েইমাদা গ্রানডি নামক দ্বীপটি সম্পর্কে জানলে শুধু বিশ্বের কোনও পর্যটকই সেখানে যেতে সাহস করবেন না। তাছাড়া, দ্বীপটিতে সর্বসাধারণের প্রবেশে সেখানকার সরকারের নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, এটি স্নেক আইল্যান্ড বা সাপের দ্বীপ হিসেবে পরিচিত। ব্রাজিলের সাও পাওলো থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত এই দ্বীপটি। পুরো দ্বীপজুড়ে রয়েছে শুধু সাপের বিচরণ। এখানে শুধু যে হাজার চারেক বিষধর সাপের বাস তা নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বিষধর সাপ গোল্ডেন ল্যান্সহেডের বাসও একমাত্র এই দ্বীপটি। গোল্ডেন ল্যান্সহেডের বিষ এতটাই শক্তিশালী যে, এর বিষ মানুষের শরীরের যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তা শরীরের হাড়-মাংস পর্যন্ত গলিয়ে দিতে পারে।

লাসকাউক্স কেভস, ফ্রান্স

বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ এই গুহাটির শিল্পকর্মের যেন ক্ষতি না হয়, তাই ফ্রান্স

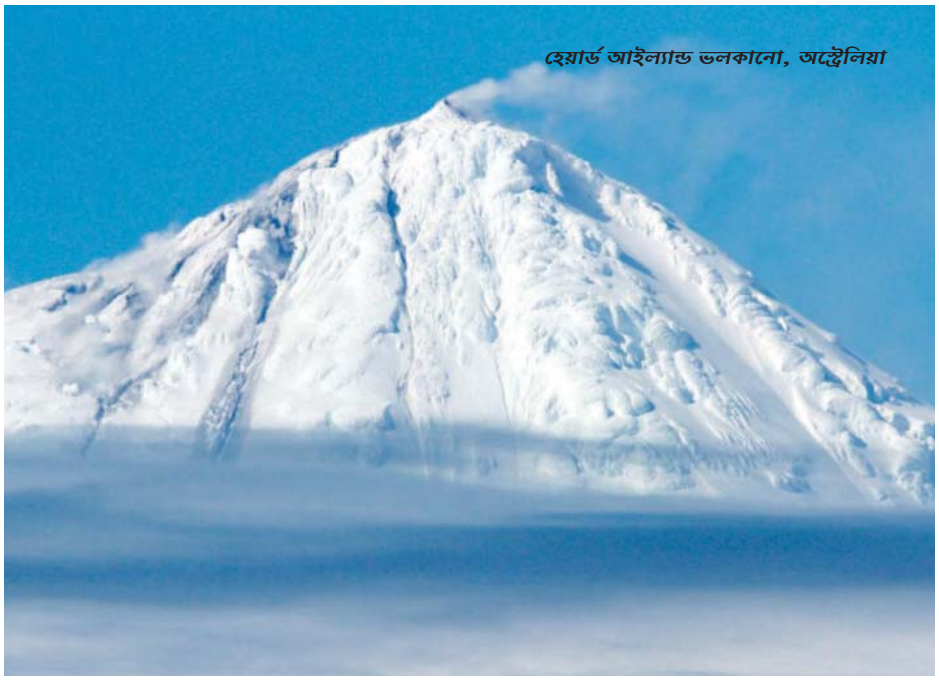
হেয়ার্ড আইল্যান্ড ভলকানো, অস্ট্রেলিয়া

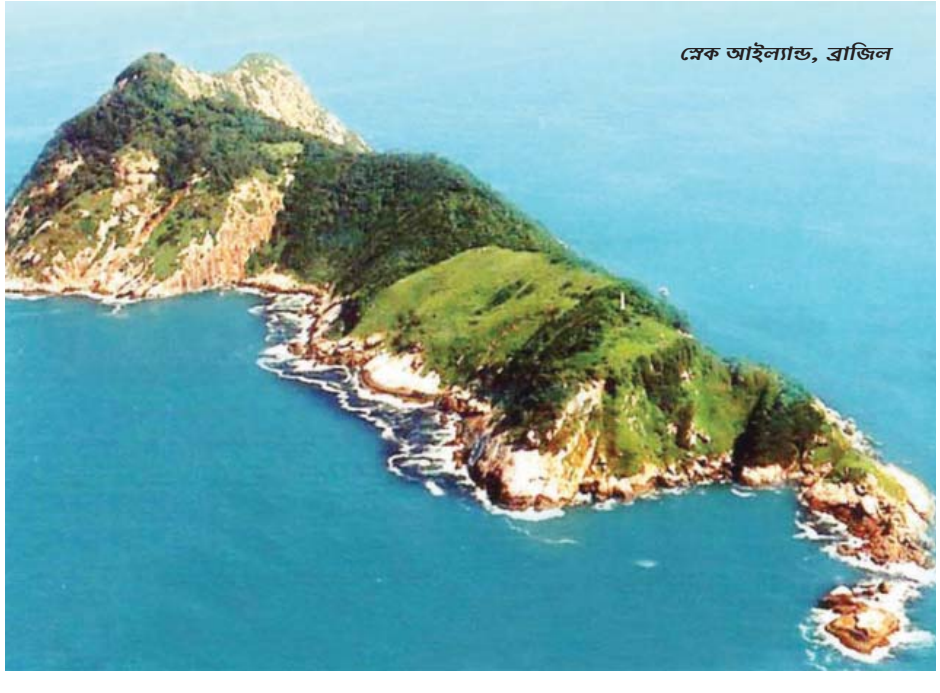
স্নেক আইল্যান্ড, ব্রাজিল

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ২০ জুন ২০১৭

জেনারেল নলেজ: যে জায়গাগুলোয় কোনওদিনই যাওয়া যাবে না

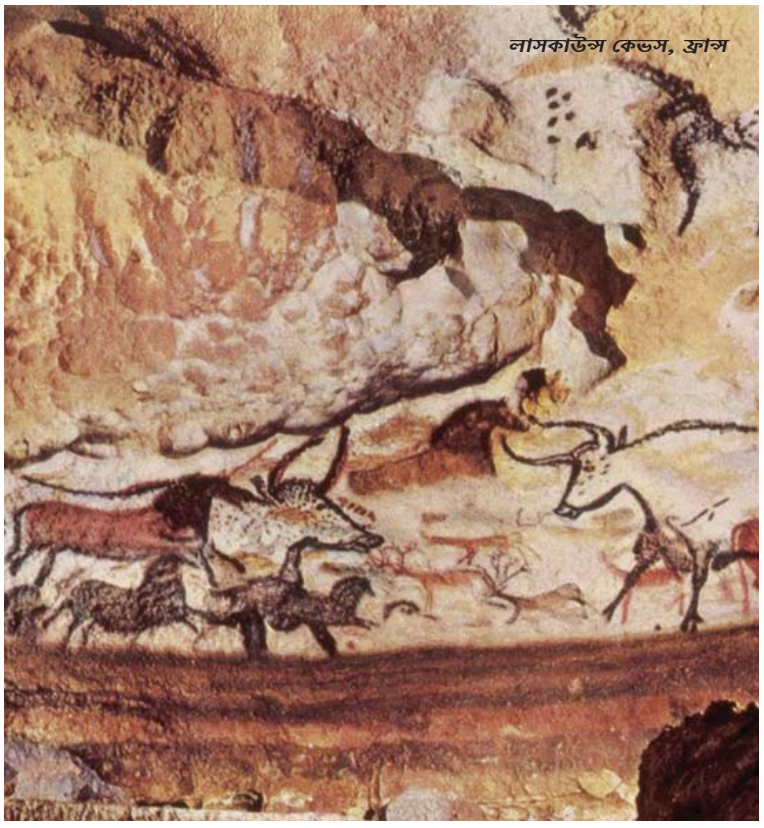
লাসকাউক্স কেভস, ফ্রান্স

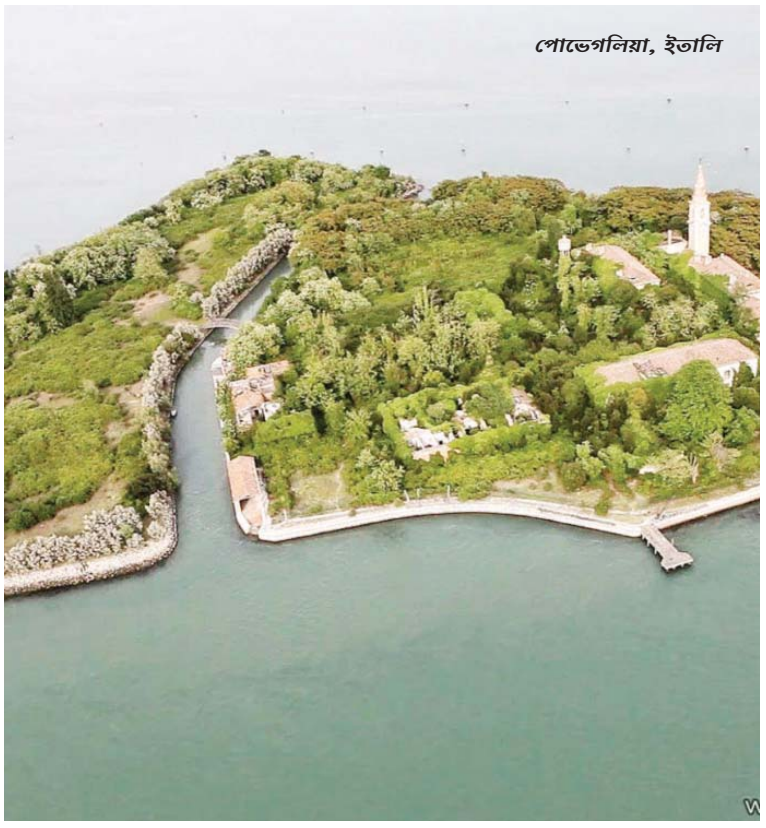
পোভেগলিয়া, ইতালি

সরকার জনসাধারণের এখানে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দিয়েছে। কয়েকজন বিজ্ঞানী মাসের মাত্র কয়েকদিন ওই গুহায় প্রবেশের অনুমতি পান। নর্থ-ওয়েসটার্ন ফ্রান্সে অবস্থিত এই গুহাটি সতের হাজার বছর আগেকার বলে ধারণা করা হয়। গুহাটির দেওয়ালে আঁকা রয়েছে ৬০০ চিত্রকর্ম, যা ১৭ হাজার বছর আগেকার আদিম মানুষের হাতে আঁকা। যার মধ্যে তখনকার সময়রে বড় প্রাণীদের ছবি অঙ্কিত রয়েছে দেওয়ালে, যেগুলো জীবাশ্ম গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। ইউনেস্কো 'বিশ্বের ঐহিত্যবাহী স্থান'-এর সম্মান দিয়েছে গুহাটিকে।

পোভেগলিয়া, ইতালি

ইতালির ভেনিস ও লিডো শহরের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত এই ছোট্ট দ্বীপটি বিশ্বের সবচেয়ে ভুতুড়ে স্থান হিসাবে পরিচিত। যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের আত্মা, প্লেগ রোগে মৃতদের আত্মা এবং খুনি ডাক্তারের আত্মা এই দ্বীপটিতে রয়েছে বলে মনে করা হয়। রোমান যুগে এই দ্বীপটি ব্যবহার করা হত প্লেগে আক্রান্ত রোগীদের রাখতে ও তাদের পুড়িয়ে মেরে ফেলতে। ১৯২২ সালে এখানে একটি মানসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু হাসপাতালটি ১৯৬৮ সালে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কেননা, হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। রোগীরা প্রায়ই মৃতদের দেখতে পেতেন বলে দাবি করতেন। এখানে একজন কুখ্যাত চিকিৎসকের কথা জানা যায়, যিনি মানসিক রোগীদের উপর ভয়াবহ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। সেই ডাক্তার নিজেও পড়ে বিকারগ্রস্ত হয়ে হাসপাতালের ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেন। অশুভ আত্মার স্থান হিসাবে পরিচিত এই দ্বীপ। তাই দ্বীপটি দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। ইতালির সরকার এই দ্বীপটিকে ২০১৪ সালে ৯৯ বছরের জন্য লিজে দেওয়ার ঘোষণা করে। কিন্তু কেউ এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ দেখায়নি।

ভ্যাটিকান সিক্রেট আর্কাইভ, ভ্যাটিকান সিটি, ইতালি

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যক্তিগত পাঠাগার হিসাবে অবিহিত করা হয় ভ্যাটিকান সিক্রেট আর্কাইভকে। অষ্টম শতাব্দী থেকে এ পর্যন্ত পোপদের ব্যক্তিগত নথিপত্র সংরক্ষিত রয়েছে এই পাঠাগারে। অনেক গোপন ডকুমেন্টও এখানে সংরক্ষিত আছে। সাধারণ মানুষের এই গ্রন্থাগারে প্রবেশের অনুমতি নেই। খুব কম সংখ্যক স্কলার বা পণ্ডিতেরই এখানে ঢোকার সৌভাগ্য হয় বা হয়েছে। তাও পোপের অনুমতি ছাড়া সেটা একেবারেই অসম্ভব। আর অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়াও অত্যন্ত জটিল। পাঠাগারের ভেতর প্রায় ৫৪ কিলোমিটার বইয়ের দীর্ঘ তাক রয়েছে। সেখানে রাখা আছে ৩৫ হাজার ভলিউম নথি। এটিকে পোপের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হয়।

আইস গ্যান্ড শ্রাইন, জাপান

জাপানের রাজবংশের দেশের উচ্চপদস্থ যাতক-যাতিকা ছাড়া অন্য সকলের প্রবেশাধিকার একেবারে নিষিদ্ধ এই শ্রাইনে বা মঠে। এই মঠটি তৃতীয় শতকে সর্বপ্রথম তৈরি করা হয়। প্রতি ২০ বছর পরপর এটি ভেঙে ফের পুনর্নির্মাণ করা হয়। এই মঠের ভেতর রয়েছে দুটি প্রধান মঠ। আর তার চারপাশে রয়েছে আরও ছোট-বড় ১২৫টি মঠ। কঠোর গোপনীয়তায় এখানে অনেক কিছুই রাখা আছে যা আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সামনে আসেনি।

এরিয়া ৫১, নেভাডা, যুক্তরাষ্ট্র

এটি মানুষের সৃষ্টি পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় স্থান। যা নিয়ে বিশ্বের কৌতূহলের শেষ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, এরিয়া ৫১ একটি সামরিকা ঘাঁটি। যার আয়তন ২৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্টের নেভাডা অঙ্গরাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে এবং লাস ভেগাস থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম রেকেল গ্রামের কাছে অবস্থিত। খুবই গোপনীয় এই সামরিক ঘাঁটি গ্রুম হ্রদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এরিয়া ৫১র এতটাই গোপনীয় যে, ২০১৩ সালের আগে পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট এর অস্তিত্ব কখনওই স্বীকার করেনি। দুর্ভেদ্য বেষ্টনীতে ঘেরা এই ঘাঁটির প্রবেশ পথেই লেখা রয়েছে, অনধিকার প্রবেশকারীকে গুলি করে হত্যা করা হতে পারে। আজ পর্যন্ত বেসামরিক কেউ দাবি করেননি, তিনি এরিয়া ৫১-য় ঢুকেছেন। যদি কেউ ঢুকেও থাকেন, তিনি জীবিত আর বেরিয়ে আসতে পারেননি তা নিশ্চিত। তাই নিশ্চিতভাবে কেউই জানে না আসলে কী হয় এই এরিয়া ৫১ অঞ্চলে। গুজব রয়েছে, এখানে ভিনগ্রহের বাসিন্দাদের মৃতদেহ সংরক্ষিত রাখা হয়।

বৃষ্টি ঘোষ

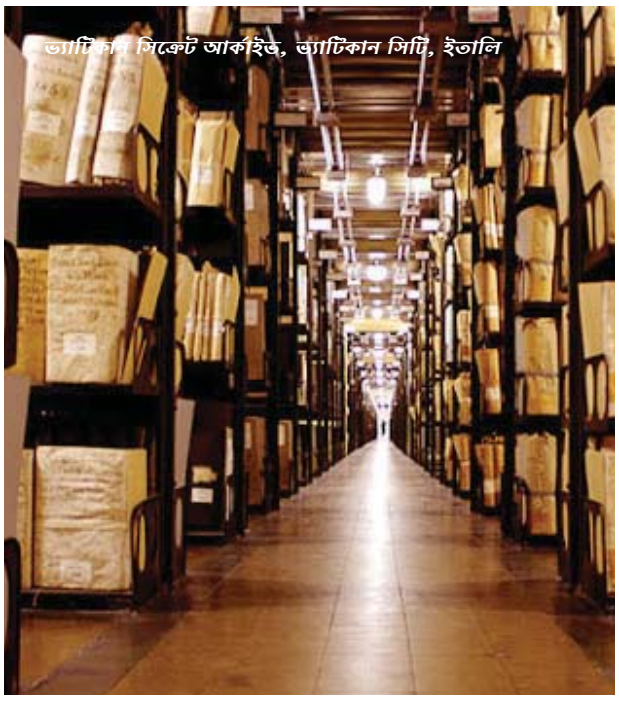
ভ্যাটিকান সিক্রেট আর্কাইভ, ভ্যাটিকান সিটি, ইতালি

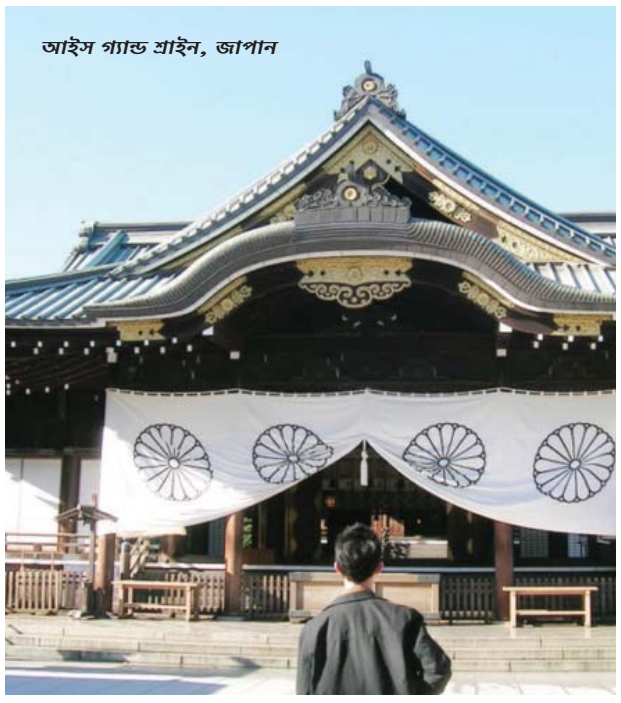
আইস গ্যান্ড শ্রাইন, জাপান

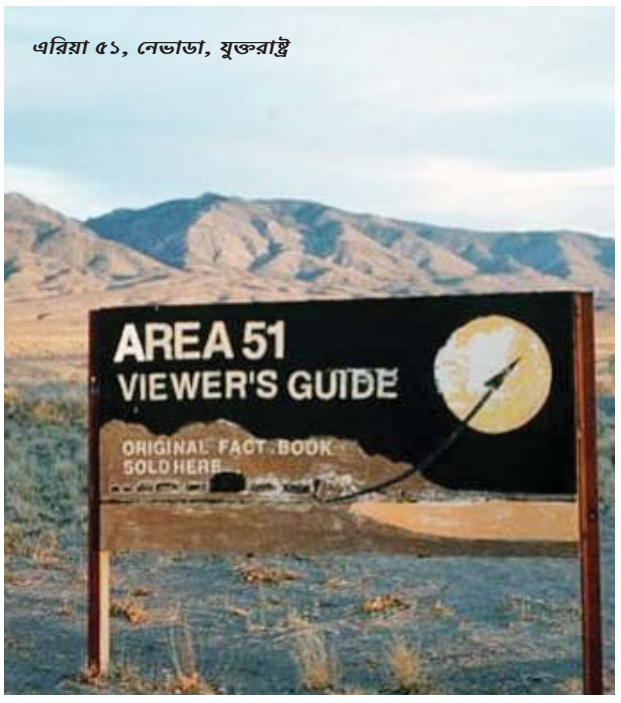

এরিয়া ৫১, নেভাডা, যুক্তরাষ্ট্র